অন্তরমহল @ কলকাতা ২
নস্টালজিয়া @ কলকাতা ৩
যুক্তি-তর্ক-আড্ডা @ কলকাতা ৪
কলিকাতা to কলকাতা ৫
গঙ্গার ঘাট ও ব্যক্তিত্ব @ কলকাতা ৬
স্টুডিও ও বেতার @ কলকাতা ৭
মৈত্রী এক্সপ্রেস: ঢাকা to কলকাতা ৮

যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২০ মার্চ ২০১৭

# কলকাতা

৮ পাতার এই ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

## থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

কলের গান এখন আর আমরা শুনি না। তবে শখ আর পকেটে টাকা থাকলে খুঁজে দেখার চেষ্টা করি, বাড়িতে সাজিয়ে রাখার জন্য। টানা রিকশার শো-পিস আমরা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখি বাড়ির শো-কেসে। মাঝে মাঝে ঝাড়পোছ করে পরিষ্কারও করি, আর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটকে বিড়বিড় করে বলি, তুলে দিলে একটু শান্তিতে হাঁটতে পারি। অটোর দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদ করি মনে মনে, কারণ মুখোমুখি সাহসে কুলোয় না। অন্যদিকে উবের-ওলার ঠেলায় চিন্তায় পড়েছে ট্যাক্সি। তাকিয়ে আমরা সকলেই ভবিষ্যতের দিকে...

ফোটো: **সৌরভ সরকার** | লেখা: **টিম কলকাতা**

## আমার চোখে কলকাতা

**সুদেষ্ণা রায়** (অভিনেত্রী)

কলকাতা আমার নিজের শহর। আমার জন্ম, বেড়েওঠা সব কিছুই তো কলকাতায়। কলকাতায় ভালো, খারাপ সব কিছুই আছে। তবুও কলকাতার প্রতি আমার একটু অদ্ভুত অনুভূতিও আছে। বহু বছর আগে রাজীব গান্ধী কলকাতাকে 'ডাইং সিটি' বলেছিলেন। কিন্তু আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি আমরা কতটা জীবন্ত। দিনে দিনে কত উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছেও। আমার তো মনে হয় এত প্রাণবন্ত শহর আর কোথাও নেই। তাছাড়া ছোটবেলায় কলকাতাকে যতটা প্রাণবন্ত দেখেছি, আজও সেটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পরিবর্তন হয়তো অনেক কিছুরই ঘটেছে, পুরনো অনেক কিছুর বদলে নতুন জিনিস এসেছে, কিন্তু কলকাতার প্রাণটা হারিয়ে যায়নি।

কলকাতার একটা আলাদা মাহাত্ম্য রয়েছে। একটা সময় যখন সাংবাদিক হিসাবে কাজ করতাম বা তারপর যখন ফিল্মের জগতে কাজ শুরু করলাম, সেই কাজের সূত্রে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরতে হয়েছে, হয়তো কোনও সময় একটু বেশি রাতও হয়েছে, সেটাও হয়তো একটু বেশি সাহসিকতা দেখানোর মতো অবস্থা, কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার কোনও দিনও মনে হয়নি কলকাতা শহরে সাহায্য করার জন্য কেউ আসবেন না। কলকাতা শহরকে কেউ খারাপ বললে আমার খুব রাগ হয়। হয়তো কিছু খারাপ লাগা আছে। আসলে কলকাতা হল আমার মায়ের মতো, মায়ের সঙ্গে যেমন ঝগড়া, অশান্তি করা যায়, কিন্তু আমার মাকে কেউ খারাপ বললে রাগ হয়, কলকাতার ক্ষেত্রে আমারও একই অবস্থা হয়েছে। কলকাতা শহরটা আরও একটু পরিষ্কার হলে ভালো লাগবে, তবে এর জন্য মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। এমন অনেক মানুষ দেখি যিনি হয়তো নিজেই নিজের আবাসনের সামনে ময়লা ফেলে দিলেন। এই মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। কলকাতার আরও উন্নতি হোক, আরও শিল্প আসুক। তাহলে কলকাতাবাসী হিসাবে আরও গর্ব অনুভূত হবে। কলকাতার বয়স তিনশো বছরের বেশি হয়ে গেল তবুও তার ঐতিহ্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সব মিলিয়ে বলব কলকাতা আমার ভালোবাসা, ভালো লাগার শহর, আমার গানের শহর, আমার শিল্পের শহর...

## চলতে চলতে কলকাতা দেখা: এসপ্ল্যানেড টু গালিফ স্ট্রিট

# বাতাস বহে সুগন্ধ

**পান্থজন**

পুরনো বাংলা ছবি দেখতে ভালো লাগে। শুধুমাত্র দেখা নয়, বিশেষ কয়েকটি ছবির, বিশেষ কিছু দৃশ্যের সংলাপ আজও গেঁথে রয়েছে মনের মধ্যে। 'আজ সে করিবন ঢাইসো সাল পহলে নবাব শা মেহমুদ নে আপনে অ্যায়েশ অর আরামকে লিয়ে ইয়ে ম্যাহেল বনওায়ে থে। সমরকন্দ, ইরাক, ইরান, আরব অর সারে হিন্দুস্তান সে চুন চুন কর হাসিন সে হাসিন লড়কিয়া উনকে হাবিসকে আগ মে জ্বলনেকে লিয়ে ইঁহা ল্যায় জাতি থি। দুবারসে গুলাবজল নিকালথা থা, ইত্তর কি ভিঙি ভিঙি খুশবু সে হাওয়া মে মস্তি ছাই র‍্যাহেতি থি, গজল কি ধুনে সামনে কি পাহাড়িও মে গুঞ্জ উঠতি থি।'

পথে চলে যেতে যেতে আজ হঠাৎ এক বিখ্যাত বাংলা ছবির এই উর্দু সংলাপের কথা মনে হল। একই সময় মনটা উদাস হয়ে গেল। আসলে চিৎপুর রোডের এক বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন একটি বস্তু চোখে পড়ল, যা দেখলে নবাব, বাদশা, জমিদার এবং বাবু কালচারের কথা মনে হয়। আজও এমন অনেক শৌখিন মানুষ রয়েছেন যাঁরা দেশি-বিদেশি মূল্যবান পারফিউম ছেড়ে এই বস্তুটি ব্যবহার করেন। কিন্তু চলার পথে থমকে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া সময়ের কথা চিন্তা করলে চলবে? কানে কানে 'ক্ষুধিত পাষান'-এর করিম খাঁ যেন বলে দিয়ে যান 'জিন্দেগি জিনেকি লিয়ে হ্যায় হুজুর,গুজরে হুয়ে বাতোকি ইয়াদ মে খোনেকে লিয়ে নেহি।' সংবিৎ ফিরে পেয়ে বুঝতে পারি আমি দাঁড়িয়ে আছি কলকাতার চিৎপুর রোড়ে, বারুচের সুস্তা নদীর পারে নয়। মনে পড়ে গেল আজ চিৎপুরের মুসলিম মহল্লায় দাঁড়িয়ে পাঠকদের শোনাতে হবে আতরের কথা।

ইত্তরের ভিঙি খুশবুর কথা তো শুনলাম। এবার একটু জেনে নিই বর্তমান বসন্তের গন্ধবিধুর সমীরণের মধ্যে ব্যস্ত ঘিঞ্জি এলাকার সুগন্ধের কথা। বস্তুটির অনেক নাম। উর্দুতে ইতর, বাংলায় আতর, ইংরেজিতে সেন্ট। আগর গাছের ছাল থেকে তৈরি এই সুগন্ধি দ্রব্যটি মূলত আসে ওপার

বাংলার চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে। আবার এপারের অসম থেকেও এর আমদানি হয়। পাওয়া যায় ভারতের সর্বত্র। মুম্বই, হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌতে এর ব্যবহার খুব বেশি। দিল্লি এবং কলকাতার মানুষেরাও আতরের সুঘ্রাণ পছন্দ করেন। এই রাস্তার বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন আকারের কাচের পাত্রে বা শিশিতে বস্তুটি বিকোচ্ছে। দোকানের কাছে গেলেই পাওয়া যায় এর সুগন্ধ। কোনওটির গন্ধ উগ্র, আবার কোনওটি হালকা, স্নিগ্ধ।

ইতিহাসের পাতা উল্টে জানতে পারি, ভারতে প্রথম আতর ব্যবহারের প্রচলন হয় মোগল রাজত্বে। বর্তমানে শুধু বাংলাদেশ বা এশিয়া মহাদেশ নয়, সারা পৃথিবীতে আতর সরবরাহের জন্য বিখ্যাত বাংলাদেশের সিলেটের মৌলবি বাজার জেলার বড়লেখা থানার অন্তর্গত

*এরপর দুইয়ের পাতায়*

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২০ মার্চ ২০১৭

সচেতন পাঠক সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন
তাই তো রোজ বাড়ছে পাঠক সংখ্যা
যুগশঙ্খ
খবরের কাগজ, গল্পের নয়

TEAM কলকাতা
**শর্মিলা চন্দ্র**
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)
**সালমা আহমেদ | সুদীপ্ত বিশ্বাস**
**অতনু পাল** (ফোটোগ্রাফার)



# ১০০ নং গড়পার

**অরিজিৎ মৈত্র**

তিনশো বছরেরও বেশি যে-শহরের বয়স, সেখানে প্রাচীন অট্টালিকা, ইতিহাস, নানান জানা-অজানা গল্প, স্মৃতি তো থাকবেই। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ঘুরলে দেখা যাবে, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু পুরনো বাড়ি যার আকৃতি ও নির্মাণশৈলী স্বতন্ত্র। সেসব প্রাচীন অট্টালিকায় বিভিন্ন সময় বাস করেছেন একাধিক বিখ্যাত মানুষ। আবার এমনও অনেক বাড়ি রয়েছে যেখানে থাকতেন এবং এখনও থাকেন সাধারণ গৃহস্থেরা। আজ উত্তর কলকাতার এমন একটি বাড়ির কথা বলব যেখানে এক সময় রোপিত হয়েছিল বাংলা শিশু সাহিত্যের বীজ। ওই বাড়িতেই ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পের নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। আবার ওই বাড়ি থেকেই শিশু সাহিত্যের কিংবদন্তিতুল্য পত্রিকা ‘সন্দেশ’ প্রকাশিত হতে শুরু করে। এবারে নিশ্চয়ই পাঠকেরা আন্দাজ করতে শুরু করেছেন কোন বাড়ির কথা বলছি।

ওপার বাংলার ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের মসুয়া গ্রাম থেকে যৌবনেই কলকাতায় চলে আসেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আকৃষ্ট হন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি। যোগাযোগ ঘটে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ২৩ বছর বয়সে বিয়ে করেন তৎকালীন বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে। নবদম্পতি সংসার পাতেন ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে। ছোটদের জন্য লিখতে লিখতে প্রয়োজন অনুভব করেন এক আধুনিক ছাপাখানার। নিজের টাকায় বিলেত থেকে আনালেন ছবি ছাপার আধুনিক যন্ত্রপাতি। নিজের বাড়িতেই খুলে ফেললেন এক ছাপাখানা। প্রতিষ্ঠিত হল ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স। ঠিকানা প্রথমে ৭নং শিবনারায়ণ দাস লেন, পরে ২২নং সুকিয়া স্ট্রিট। তারপর উপেন্দ্রকিশোর নিজেই জমি কিনে নিলেন ১০০ নং গড়পার রোডের উপর। এই জমির উপর ১৯১২ সালে বাড়ি তৈরি করেন তিনি। দেশীয় স্টাইলের ওই বাড়ি থেকেই ১৩২০ বঙ্গাব্দের (১৯১৩) বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হল ‘সন্দেশ’। সেই বাড়িতেই ছিল উপেন্দ্রকিশোরের সাধের ছাপাখানা, সন্দেশ পত্রিকার অফিস, আবার পরিবারের বাসস্থানও। ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স থেকেই এক সময় নিয়মিত ছাপা হতো ‘প্রবাসী’, ‘দ্য ইন্ডিয়ান মিরর’ প্রভৃতি পত্রিকা। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে পুত্র সুকুমারও আজীবন কাটিয়েছিলেন তাঁদের এই গড়পার রোডের বাড়িতে। গড়পার রোডের বাড়িতেই পরবর্তীকালে সুকুমার তৈরি করেন ‘ননসেন্স’ ক্লাব। তিনতলা বাড়ির দুটিতলের দু’ধারেই রয়েছে টানা বারান্দা, সামনের দিকে জানালার দু’পাশে আছে তিনটি

বড় থাম। চতুর্ভুজাকৃতি এই বাড়িতে এক সময় প্রতি সন্ধ্যায় হতো গুণীজন সমাবেশ। সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিতের জন্মও সম্ভবত এই বাড়িতে। আর এখানেই ১৯২৩ সালে সুকুমারের মৃত্যু হয় কালাজ্বরে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ইউ. রায় অ্যান্ড সন্সের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে শুরু করে। ফলে এক সময় গড়পারে, রায় পরিবারের বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়। মায়ের সঙ্গে সত্যজিৎ চলে যান ভবানীপুরের মামার বাড়িতে।

বর্তমানে এই ঐতিহাসিক বাড়িতে চলছে ‘এথেনিয়ম ইনস্টিটিউটশন’ নামক স্কুল। সামনে উঁচু পাঁচিল থাকায় একতলার বেশ কিছুটা অংশ ঢাকা পরে গিয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন এই বাড়ির সামনে ফুটপাতে রয়েছে সত্যজিৎ স্মরণে ফলক, যাতে লেখা আছে ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’। এর পাশেই রয়েছে উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার ও সত্যজিতের আবক্ষমূর্তি। রায় পরিবারের এই বাড়ি বিক্রি ও হস্তান্তর হয়ে যাওয়ার পরেও বাড়িটি যে অক্ষত আছে এবং বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ হয়, এটাই সৌভাগ্যের।

**চলতে চলতে কলকাতা দেখা:** প্রথম পাতার পর

সুজানগর গ্রামটি। সেখানে গেলে চোখে পড়বে প্রচুর পরিমাণে আগর গাছ। আগর গাছ যাঁরা চেনেন এবং চিহ্নিত করেন, তাঁদের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ‘দৌড়াল’। সিলেটের পাহাড়ে এখনও আতরের চাষ হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ওইসব পাহাড়কে ‘আতর পাহাড়’ বলে ডাকেন। বয়স্ক আগর গাছের গায়ে দা দিয়ে কুপিয়ে রেখে দিলে সেই অংশ দিয়ে রক্তের মতো ঘন রস পড়তে শুরু করে। গাছের সেই রস দিয়েই তৈরি হয় সুবাসিত আতর। ইসলাম ধর্মে আতর একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ঈদের দিনে গোসল করে মানে স্নানের পরে আতর মাখা সুন্নত। পুরুষদের জন্য একমাত্র হাহাল সুগন্ধি হল আতর আর মৃতের একমাত্র প্রসাধন হল আতর।

বর্তমানে দেশে এবং বিদেশে এর বিপুল চাহিদা রয়েছে। শৌখিন ক্রেতারা তাঁদের ব্যবহারের জন্য অনেক রকম আতর কেনেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল জান্নাতুল নাঈম, জান্নাতুল ফেরদাউস, সাইখা, হাজরে আসওয়াদ, সুলতান, উদ, কিং হোয়াইট, আল-ফারেজা, কুল ওয়াটার ইত্যাদি। ট্রামলাইনের পাশের দোকানগুলিতে খোঁজ করে জানা গেল এইগুলির দাম শুরু হয় ৫০ টাকা থেকে। এরপর জিনিস এবং ব্র্যান্ড অনুযায়ী দামও বাড়তে থাকে। ইদ-উল-ফিতর, ইদুজ্জোহার মতো উৎসবগুলিতে এর চাহিদা বাড়ে। আবার বছরের অন্যান্য সময়েও সুগন্ধের দ্রব্যটি ভালোই বিকোয়। এই বিষয়ে জাত-ধর্মের কোনও বেড়াজাল নেই। যাঁরা শৌখিনতার মধ্যে থাকতে ভালোবাসেন, তাঁরাই এর ক্রেতা। এক সময় কলকাতার বাবু কালচারের অন্যতম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ছিল আতর।

হুঁকো, পাঞ্জাবির পরে আজ আলোচনা করলাম আতর সম্পর্কে। পথ চলতে গিয়ে যত দেখছি ততই ভাবছি, এই শহরের পথে-ঘাটে কত বিচিত্র ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে প্রতিদিন। সামনের দিন ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে যাব চিৎপুরের অন্যতম এক ঐতিহাসিক স্থানে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বঙ্গভঙ্গের মতো ঐতিহাসিক ঘটনা, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি। তার সঙ্গে রয়েছে প্রার্থনার সুর।

*ফোটো: লেখক*

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২০ মার্চ ২০১৭

# চিঠি পেল বনশ্রী

**মধুশ্রী মৈত্র**

বনশ্রীকে নিয়ে লিখতে গেলে সবার আগে মনে পড়ে রাসবিহারীর মোড়ে সন্তোষ সেনগুপ্তের গানের স্কুল সুরমন্দিরের কথা। সে সময়ে সুরমন্দিরে যেন চাঁদের হাট বসত– চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ রায়, শক্তি নাগ, চিত্রা সেন– কে না আসতেন সেখানে। সেই সময় আমি ও আমার স্বামী, সন্তোষদা আর সমরেশ রায়ের বোন মীরা মজুমদারের কাছে গান শিখতাম। সমরেশ রায় ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সহকারী এবং নিজেও একজন গুণী সংগীতশিল্পী। ওখানে একদিন সন্ধেবেলা অল্প বয়সি, হাসি খুশি একটি মেয়ে এল সন্তোষদার কাছে গান শিখতে। তাকে দেখেই সন্তোষদা উচ্ছ্বসিত। আমাদের বললেন, 'ও বনশ্রী, দারুণ গান করে। অসম্ভব সুন্দর ওর গায়কি আর গলার রেঞ্জ।' আলাপ হল চা, মুড়ি, তেলেভাজা সহযোগে। তারপর থেকে ও আমাদের সঙ্গে মীরাদির কাছে গান শিখতে শুরু করল। একবার সুরমন্দিরের প্রযোজনায় 'শ্যামা' অভিনীত হয়েছিল। মনে আছে বনশ্রীও তাতে গান গেয়েছিল। এরপর তো বনশ্রীর উত্তরণের পালা।

একটার পর একটা হৃদয় ছোঁয়া গান। মনকেমন করা সব গানের কথা আর সুর। তার মধ্যে একটি গান তো আজও সবার মুখে মুখে ফেরে। 'আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম', মনে পড়ে যায় উত্তর কলকাতার কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিটে আমার বাপের বাড়ির পাড়ায় ফাটাকেষ্টর কালীপুজোর ফাংশনে ও অনেক গানের সঙ্গে এই গানটিও গেয়েছিল। সেই গান শুনতে পাড়ার প্রতিটি ছাদে লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। কিংবদন্তি গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর তিনজন খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন, তাঁরা হলেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায় ও প্রবীর মজুমদার। প্রবীর মজুমদার খুব বেশি পাদপ্রদীপের আলোয় আসেননি, কেন জানি না। কিন্তু তাঁরই সুরে অনেক শিল্পীর গাওয়া গান বিখ্যাত হয়েছিল। যেমন, নির্মলা মিশ্রের 'ও তোতাপাখি রে', ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'মাটিতে জন্ম নিলাম', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'আমি তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে বাঁচার এ ঠিকানা'। প্রতিটি গান কথা ও সুরের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

এরপর তো বনশ্রীর গান রেকর্ড, ক্যাসেট, ছায়াছবি, টিভি সিরিয়াল আর আমাদের আকাশবাণী এবং কলকাতা দূরদর্শনের অগণিত অনুষ্ঠানে অনুরণিত হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারে সেই অনেকদিন আগের দেখা হাসিখুশি সাদাসিধে মেয়েটি। আসলে জীবনের অনেক ওঠাপড়া, সংগ্রাম তাঁর শিল্পীসত্তাকে যেমন বিকশিত হওয়ার পথে বাধা দিতে পারেনি, তেমনই তখনকার যুগে জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া মেয়েটি পারেনি মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে। তাই তো সে আমাদের কাছে কখনওই দূরের তারকা হয়ে ওঠেনি। তবে সে সময় অনেক বিখ্যাত মানুষকেই দেখেছি মাটির কাছাকাছি, তাই তাঁদের সান্নিধ্যে যাওয়ার সময় দ্বিধাগ্রস্ত হতে হতো না। এখন কি এটা সম্ভব? কী জানি!

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তখন প্রয়াত। আমরা হেমন্ত স্মৃতি সংসদ ও চিত্রবতী নামক সংস্থার মাধ্যমে বহুবার অনুষ্ঠান করেছি। সেখানে কোনওরকম পারিশ্রমিক ছাড়া কয়েকজন শিল্পী একাধিকবার এসেছেন গান গাইবার জন্য। বিড়লা অ্যাকাডেমির সেই স্মরণ সন্ধ্যায় অনেকবারই এসেছেন উৎপলা সেন, বনশ্রী সেনগুপ্ত, সবিতাব্রত দত্ত, পূর্বা দাম, সুপ্রীতি ঘোষ, শ্রীকান্ত আচার্য, স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত প্রমুখ। দুবছর আগে নন্দনে দেবকীকুমার বসুর স্মরণে এক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেষ দেখা। তখনই ও বলেছিল ওর প্রতাপাদিত্য রোডের নতুন ফ্ল্যাটে যেতে। আবার কিছুদিন আগে আমার ছেলের মাধ্যমে ওঁর বাড়িতে যেতে বলেছিল। শারীরিক কারণে যাওয়া আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভেবেছিলাম কয়েকদিন পরে যাব। কিন্তু সেই যাওয়া থেমেই রইল।

এখনও ভাবতে পারছি না বনশ্রীর এই আকস্মিক চলে যাওয়াটা। বনশ্রীর স্বামী প্রয়াত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ও সুখের ঘরের চাবিকাঠি হারিয়ে ফেলেছিল। একটাই সান্ত্বনা, এতদিন বাদে আবার সেই চাবিকাঠি ও খুঁজে পেয়েছে। আর আমাদের জন্যেও রেখে গেল অনেক আনন্দের স্মৃতি আর মন কেমন করা ও ভালো লাগা অনেক গান।

**বাঁদিক থেকে শ্যামা নৃত্যনাট্য পরিবেশনে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, গোরা সর্বাধিকারী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মীরা মজুমদার, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত।**

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২০ মার্চ ২০১৭



# ই-কমার্সে বসতে লক্ষ্মী, ক্ষতির প্রহর গুনছে খোলা বাজার

**সুদীপ্ত রায়চৌধুরী**

সময় বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে প্রজন্ম। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যাচ্ছে আমাদের পছন্দও। রোদে ঘুরে বা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এ দোকান, ও দোকান ঘোরার দিন প্রায় শেষ। এমনকী, পুজোর মরসুমে ভিড়ে ঠাসা ফুটপাতও উধাও হতে বসেছে। সৌজন্যে, অনলাইন শপিং। আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কি-বোর্ডে আঙুল ছুঁইয়ে জেন ওয়াই এখন নিজেদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপেই সেরে ফেলছে শপিং।

পুজোর ভরা মরসুম হোক বা ক্রিসমাসের আবহ, সাবেকি দোকান বা রিটেল শপগুলো খদ্দেরদের টানতে হিমশিম খাচ্ছে, তখন কিন্তু রমরমিয়ে ব্যবসা করছে বিভিন্ন অনলাইন শপিং সাইট। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন বা স্ন্যাপডিলের মতো বেশ কিছু সাইটে মানুষ এখন হুমড়ি খেয়ে কেনাকাটা করছে। কলকাতা হোক বা শহরতলি, সব জায়গাতেই এখন হিট অনলাইন শপিং। কিন্তু এতকাল দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে দেখার পর কিনতে অভ্যস্ত শহরবাসী কেন ইদানীং অনলাইন শপিংয়ে ঝুঁকছেন? এ নিয়ে জানতে চাওয়া হলে শ্রীরাম আর্কেডের এক পোশাক ব্যবসায়ী মহম্মদ রুস্তম জানালেন, 'এখন নেটে অজস্র অনলাইন শপিং সাইটগুলোর চটকদার বিজ্ঞাপন ছেয়ে আছে সর্বত্র— যারা ডিনার সেট থেকে নেকলেস, সোফা থেকে জামাকাপড়, মোবাইল ফোন সবই বেচে থাকে। সঙ্গে রয়েছে চোখধাঁধানো অফার। স্বাভাবিক ভাবেই অনলাইনে ঝুঁকছে আধুনিক প্রজন্ম।' তবে এই পরিবর্তনে রীতিমতো অবাক বছর ষাটের পোশাক ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম। নিউ মার্কেটে নিজের দোকানে বসে তিনি বললেন, 'মাত্র বছরকয়েক আগেও কলকাতার ক্রেতারা জামাকাপড় চোখে না দেখে কেনার কথা ভাবতেও পারতেন না। কিন্তু ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনের মতো বিভিন্ন সাইটের সুবাদে সেই অভ্যাস দ্রুত বদলাচ্ছে। তাই মার খাচ্ছে আমাদের ব্যবসা। তবে এখনও অনেক মানুষ দোকানে নেড়ে-ঘেঁটে জামাকাপড় কিনতেই বেশি পছন্দ করেন। সেটাই বাঁচোয়া। সবাই অনলাইনে জামাকাপড় কিনলে আমরা যাব কোথায়?'

মা-বাবারা পুজোর আগে নিউ মার্কেট, গড়িয়াহাটে গেলেও আধুনিক প্রজন্মের কলেজপড়ুয়া থেকে আইটি প্রোফেশনাল প্রায় সবাই ঝুঁকছেন অনলাইন শপিংয়ের দিকেই। এবং তা এত দ্রুত হচ্ছে যে, এই তথাকথিত ই-টেলাররা ব্যবসার পরিমাণে পেছনে ফেলে দিচ্ছেন মেট্রো শহরগুলোর ঝকঝকে মলের রিটেলারদেরও। কম্পিউটারের কাছে হার মানছে দোকানের সুদৃশ্য তাক। বহুজাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত দিশা মজুমদারের কথায়, 'ব্যস্ততার কারণে শপিং করার খুব একটা সময় হয়ে ওঠে না। এছাড়া যানজট আর ভিড় ঠেলে মার্কেটে যেতেও ইচ্ছা করে না। তাই অনলাইনই বেস্ট। মোবাইল থেকেই শপিং কমপ্লিট।' তবে এই শপিং নিয়ে সতর্ক করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাতুল সরকার। তিনি বললেন, 'বিদেশি জিনিস অনলাইনে কিনতে গেলে ইমপোর্ট ফিজ দিতে হয়। কিন্তু বহু অনলাইন ক্রেতাই এই মাশুলের ব্যাপারে খুব একটা ওয়াকিবহাল নন। তার জন্য ডট কম, ডট ইন, ডট ইউকে ডোমেইনের তারতম্য নিয়ে একটু জানতে হয়। যেমন: প্লেস্টেশন ৪-এর দুটি গেম দ্য কল অব ডিউটি ও মডার্ন ওয়ারফেয়ার রিমাস্টার্ড— এই দুটির টু-ইন-ওয়ান প্যাকটির দাম সোনি ইউএসএ সাইটে ৩৫৩ ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় দাম দাঁড়ায় প্রায় ২৫,০০০ টাকা। এই প্রোডাক্টটি যখনই সোনি ইউএসএ-র সাইট থেকে কিনতে যাবেন তখনই অ্যামাজন জাতীয় ই-কমার্স সাইটে রিডিরেক্ট করা হবে আপনাকে। সেখানেই চূড়ান্ত বিলে ধার্য হবে ইমপোর্ট ফিজ। শিপিং ও হ্যান্ডলিং মিলিয়ে গেম প্যাকটির দাম যদি দাঁড়ায় ২৭,০০০ টাকা, তবে তার উপরে আরও ৮০০০ টাকা ইমপোর্ট ফিজ যুক্ত হবে। অর্থাৎ যে-গেম প্যাকটি পাওয়ার কথা ছিল ২৭,০০০ টাকায় ফ্রি ডেলিভারিতে, তার দাম দিতে হবে ৩৫,০০০ টাকা।'

জটিলতা কিছু আছেই। কিন্তু তারপরও ফ্যাশনিস্তাদের দমানো সহজ নয়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সোমদত্তা সরকারের কথায়, 'হাতে গোনা কয়েকটা শপিং মল। পছন্দের ব্র্যান্ডের সংখ্যাও বেশ কম। তাহলে ইচ্ছেমতো শপিং করবেন কী করে? তাই সহজ উপায় রয়েছে আঙুলের ডগাতেই। অনলাইনে এমন অনেক কিছু পাওয়া যায়, যা রিটেল স্টোরগুলোয় পাবেন না। স্ট্রিট স্টাইল শপিং, বোহো জাংক জুয়েলারি, কোয়ার্কি স্টেশনারি, সবই পেয়ে যাবেন অনলাইনে। জাবং, মিনট্রা, অ্যামাজন, কুভ্স ছাড়াও অনেক অপশন রয়েছে। একটু ফেসবুক-ইনস্টাগ্রাম ঘাঁটলেই এমন অনেক সাইট পেয়ে যাবেন যেখানে আরও নানা ধরনের জিনিস রয়েছে।' তবে সব জেন ওয়াই কি এর সঙ্গে একমত? মোটেও না। যেমন, শিলিগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়ুয়া মধুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'অনলাইনে কেনাই যায়। কিন্তু মা-বন্ধুদের সঙ্গে দোকান ঘুরে কেনার মজাটা কিন্তু সেখানে নেই। তাছাড়া অনলাইনে কোনও ড্রেস পছন্দ করে কেনার পর সেটা ফিটিংস না হলে মনখারাপ লাগে। শপিং মল থেকে কিনলে সে ঝামেলা নেই।' অনলাইনে জামাকাপড় কেনা নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় থাকেন সরকারি চাকুরে প্রণব মণ্ডলও। তাঁর কথায়, 'ছেলেমেয়ের চাপে দু-একবার কিনেছি। জামাকাপড় নিয়ে সমস্যা না হলেও অনলাইনে ডেবিট কার্ডের ডিটেলইস দেওয়া নিয়ে কিছুটা ভয় থেকেই যায়।' তাঁর ভয় যে অমূলক নয়, তা জানিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সাম্য রাহা। তিনি বলেন, 'এখানে এখন ব্যান্ডউইথ স্পিড বাড়ছে ও ইন্টারনেটের খরচ কমছে ও আরও বেশি লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন তাই অনলাইন শপিংয়ের প্রবণতা অবধারিতই ছিল। কিন্তু ভারতীয় ক্রেতারা অনলাইনে আর্থিক লেনদেন করার ব্যাপারে খুব সতর্ক ও রক্ষণশীল— তাঁদের কার্ডের ডেটা নিরাপদ থাকবে কি না এটা তাঁদের একটা দুশ্চিন্তার বিষয়।'

তবে সবাই যে মধুমিতা বা প্রণববাবুর মতো ভাবেন না, সে কথা সাফ জানালেন গড়িয়াহাট বা নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। নোট বাতিলের ধাক্কা এসে লেগেছে তাঁদের ব্যবসাতেও। কলকাতায় ফুটপাথের হকারের সংখ্যা তিন লক্ষের আশপাশে। এর মধ্যে গড়িয়াহাটে রয়েছেন প্রায় সাড়ে সাত হাজার। শীতের মরসুমে সোয়েটার-জ্যাকেট বিক্রি করেন যাঁরা, তাঁরাও ক্রেতার অভাবে হতাশ। তবে হাল সবচেয়ে খারাপ থালা, বাসন এবং ঘর সাজানোর বিভিন্ন উপকরণ বিক্রেতাদের। এমনকী, ফুটপাথে সিনেমা এবং গানের সিডির বিক্রেতারাও বলছেন, 'বাজার নেই।' গড়িয়াহাটের ব্যবসায়ী মনোতোষ সাহা জানালেন, 'গড়িয়াহাটের ফুটপাথে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ক্রেতার সংখ্যাই বেশি। হাতে কেনাকাটা করার মতো খুচরো টাকা না থাকায় অনেকেই বাজার এড়িয়ে চলছেন। কিন্তু অনলাইনে সহজেই নেট ব্যাংকিং বা ডেবিট কার্ডের সাহায্যে লোকজন কেনাকাটা করছে।' তাই ক্রেতাদের চাহিদা মিটলেই লোকসান হচ্ছে দোকানদার বা ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের। কয়েকজন দোকানদার আবার জানালেন, এই অনলাইন শপিং সাইটগুলির সুবিধা হল তাদের দোকান খুলে বসার খরচ নেই বলে ওভারহেড কস্টও কম, ডিসকাউন্টও তাই বেশি।

দেশের অর্থনীতি উদার হয়েছে আর ইন্টারনেটের ভেলায় ভেসে লোকাল হয়েছে গ্লোবাল। কিন্তু লোকাল এখন গ্লোবাল হলেও, ফুটপাত এখনও ওয়েবসাইটে ঠাঁই পায়নি। তাই এখনও রোজ পসরা সাজিয়ে ক্রেতাদের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় দোকানিদের। বিক্রি কম হলে কপালে বাড়ে চিন্তার ভাঁজ। অধীর আগ্রহে ক্রেতার অপেক্ষায় রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে অপলক দু'টি চোখ। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিতে জেট স্পিডের গতিতে ছুটে চলা সোসাইটির সে সব দেখার সময় কোথায়!

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২০ মার্চ ২০১৭

# চুরি-ডাকাতি

**কৃষ্ণগোপাল রায়**

প্রতিষ্ঠার সময় কলকাতা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সুতানটী অঞ্চলে গঙ্গার পার ঘেঁষে ছিল কিছু তাঁতিদের বাস। তাদের মহাজন কিছু শেঠ, বসাক ছিল নদী প্রভাবিত চিৎপুর অঞ্চলে। গোবিন্দপুর প্রান্তে ছিল কালীঘাট মন্দির। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ চলত গঙ্গার জলপথে। বর্তমান কলকাতার ভূতল জুড়ে ছিল বাদার আর জঙ্গল। কুমিরের উৎপাত ছিল, ছিল জঙ্গলে শ্বাপদ আর ডাকাত। চিৎপুরের ভিতর দিয়ে যে-রাস্তা কালীঘাট পর্যন্ত যেত, সেই পথ ছিল ডাকাতদের মুক্তক্ষেত্র। সেজন্য পুণ্যার্থী যারা যেত কালীঘাট তারা যেত দলবদ্ধ ভাবে। অবশ্য তাতেও নিস্তার ছিল না। অনেকে বলেন, চিতে নামের জনৈক ডাকাতের নাম থেকে থেকেই হয়েছে চিৎপুর। অনেকে আবার বলেন, এই চিতে ডাকাত যে দেবী পুজো করতেন তাঁর নাম থেকেই হয়েছিল চিত্রেশ্বরী, বা চিত্রেশ্বরী এবং তা থেকেই চিত্রেশ্বরীপুর, পরে চিৎপুর নামের জন্ম। অনেকেই বলেন, নরবলি দেওয়া হতো এখানে। আসল তথ্য হল, ১৬১০ সাল মহাদেব ঘোষ চিত্তেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেসময় ছিলেন হুগলির অধিবাসী।

বিখ্যাত রঘু ডাকাতের বিরাজ ক্ষেত্রও ছিল সংলগ্ন অঞ্চল। কাশীপুর রোডে বামন দাস, মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরবাড়ির পাশে, সেখানে আগে কাশীপুর বরানগর থানা ছিল সেখানেই রঘু ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত পাথরের শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে। রঘু ডাকাতের ভূ-সম্পত্তি ছিল আর একটু এগিয়ে বনহুগলিতে।

চুরি-ডাকাতি নিয়ন্ত্রণে নবাবি ব্যবস্থায় দায়িত্ব ছিল ফৌজদারের ওপর। ফৌজদারদের অধীনে ছিল মনসবদার, প্রয়োজনে ফৌজদারেরা সৈন্যও নিতে পারত। অনেক সময় সসৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে ফৌজদারকে যেতে হতো ডাকাত ধরতে, তবে কলকাতার পরিসীমায় এইরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসক হলে এখন চুরি-ডাকাতি নিয়ন্ত্রণে তথা নগরমধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রাথমিক ভাবে পরিকাঠামো গত কিছু পরিবর্তন করা হয়। থানা ও কোতোয়ালি ব্যবস্থা আগের মতোই থাকল। তাদের কাজকর্ম দেখা, তাদের সাহায্য করার জন্য একজন করপোরাল ও ছয়জন ইংরেজ সৈন্যকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হল।

কিন্তু এতেও চুরি-ডাকাতি কমল না। কাউন্সিল ও চুরি-ডাকাতির শাস্তি তীব্র করা হল। যেসব চোর ও ডাকাত মানুষ হত্যাকারী ও দাগি কোতোয়ালীতে বন্দি ছিল 'তাহাদের প্রত্যেকেই গালে লোহা পোড়াইয়া ছ্যাঁকা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। তৎপরে তাহাদিগকে কলিকাতা হতে নদী পার করাইয়া অপর পাড়ে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

এই ব্যবস্থাতেও চোর-ডাকাতের উপদ্রব দ্রুত কমে যায়নি। কাউন্সিলের সদস্যরাও শাস্তি বিধান কঠোর করেই চুরি-ডাকাতি কমবে বলে আশ্বস্ত হয়নি। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেছেন, 'এদেশীয় চোরগণ কলিকাতা শহরের মধ্যে বড়ই উৎপাত করেছেন। ইহারা সাধারণ ও কোম্পানির এদেশীয় চাকর-বাকরদের অনেককে অস্ত্রাহত করিয়া হত্যা করেছে বা তাহাদের হত্যা করিয়াছে।'

কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে অধিক পরিমাণে পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত করা প্রয়োজন।

এখানেই দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষণীয় পরিবর্তন হল। সুশাসনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পুলিশ প্রয়োজন। বস্তুত এরপর থেকেই শহরে ডাকাতি এবং চুরির সংখ্যা কমতে থাকে। তবে অপরাধের রূপ বদলাতে থাকে শহর জীবনের বিকাশক্রমে।

পলাশির যুদ্ধের পর নিশ্চিন্তভাবে প্রশাসন পরিকাঠামোয় মন দিতে পারে কোম্পানির প্রশাসকরা। ১৭৬৭ সালে কাউন্সিলের এক কার্যবিবরণীতে পাওয়া যাচ্ছে।

লালবাজারের জেলখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এহেতু কয়েদিদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। তবে এখানে স্ত্রীলোক কয়েদিদের জন্য কোনরূপ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই। বড়বাজারের জেলাটি ক্ষুদ্রায়তন এবং কয়েদিগণ প্রায়ই পীড়িত হইয়া পড়ে। লালবাজারের জেলাখানায় ৪/৫ শত কয়েদী ধরিতে পারে। উপস্থিত সেখানে ২২০ জন কয়েদী আছে। কয়েদিদের আহারাদির সম্বন্ধে কোনরূপ তদারক হয় না। তাহারা এজন্য বড়ই কষ্ট পায়। ইহার প্রতিকার জন্য তিনি (জমিদার সাহেব) ব্যবস্থা করিতেছেন, দশ টাকায় একজন জেল ওভারসিয়ার নিযুক্ত করা হোক। তিনি প্রতিদিন প্রাতে জেলখানায় উপস্থিত থাকিয়া, কয়েদিদের আহারাদিদের সঙ্গে বন্দোবস্তো করিয়া দিবেন।

এই কার্য বিবরণী থেকে স্পষ্ট হচ্ছে প্রশাসনিক সংবেদনশীলতা। নবাবি এই আমলে এই সংবেদনশীলতা ছিল না। ফলে কোম্পানির সরকার দ্রুত জনপ্রিয় ওঠে। তবে দুটি জেলখানায় প্রায় ৪০০ কয়েদি দেখে বোঝা যায়, চুরি-ডাকাতি এবং অন্য অপরাধ নিতান্ত কম ছিল না সেই সময়ের কলকাতাবাসীর তুলনায়। কয়েদিদের মধ্যে যে মেয়েরা থাকত সেই সময়ে তা বোঝা যাচ্ছে তাদের জন্য পৃথক প্রয়োজনীয়তার কথায়।

মগ ও পর্তুগিজরা এ-সময়ের কুখ্যাত ডাকাত। চট্টগ্রাম ও বার্মা সীমান্ত থেকে এসে বাংলার নানা স্থানে দল বেঁধে ডাকাতি করত মগেরা। তবে তারা ডাকাতি করত প্রধানত জলপথে। এদের এই লুঠপাট ডাকাতি থেকেই মগের মুলুক প্রবাদ তৈরি হয়েছে বাংলায়। পর্তুগিজরাও জলপথেই ডাকাতি করত বেশি, তবে জাহাজ থেকে নেমে লোকালয়েও তারা লুঠপাট করত। শিশু মহিলা তুলে নিয়ে গিয়েও ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী হিসাবে বেচে দিত এরা। ১৭৮৪-এর মার্চ মাস থেকে গেজেট প্রকাশ শুরু হয়। এই প্রথম গেজেটেই জানা যায়, কলকাতায় যেসব পর্তুগিজরা প্রবেশ করবে সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা অবধি, তারা শহরে থাকতে পারবে। পাঁচটার সময় মাঝি-মাল্লা সহ নিজেদের জাহাজে ফিরে না গেলে তাদের জেলে পোরা হবে, এই রকম আদেশ জারি করা হয়েছে।

শাসনব্যবস্থার কঠোরতায় অনেক চোর-ডাকাত কলকাতা ছেড়ে, শ্রীরামপুরে কিংবা ফরাসিদের চন্দননগরে পালিয়ে যায়। এমন সাক্ষ্য পেলে পুলিশসুপার উক্ত দুই সরকারে চিঠি লিখে অপরাধীদের ফিরিয়ে এনে বিচার করত। রামকান্ত মুন্সী কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে তাঁরই বাড়িতে বিতাড়িত ভৃত্য বনমালী শ্রীরামপুরের বিখ্যাত সিঁদেল গোবিন্দরাম চক্রবর্তীকে দিয়ে চুরি করায়। প্রচুর ধনরত্ন চুরি করার পর নিজের ভাগ বুঝে নিয়ে গোবিন্দরাম এবং তার দলবল সহ শ্রীরামপুরে চলে যায়। পুলিশ সুপার মট সরেজমিন তদন্ত করতে আসেন করতে আসেন এই চুরির এবং ঘরের লোকের যোগাযোগ সন্দেহ বনমালীকে গ্রেফতার ও জেরা করলে সে সব সত্য প্রকাশ করে ফেলে। তখন মট দিনেমার সেটেলমেন্টে চিঠি লিখে গোবিন্দরামকে ফেরত এনে গ্রেফতার করেন। গোবিন্দরাম হাজতেই গলায় দড়ি দেয়।

স্মরণীয় গোবিন্দরাম ব্রাহ্মণ! তবে সেকালে চুরি-ডাকাতি একটা ভালো ব্যবসা। নবাবী আমলে তো জমিদাররাও ডাকাতি করত। কোম্পানি আমলে বখাটে, জুয়াড়ি, মদ্যপ, এবং ইংরেজ ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, বাঙালি সবাই একসঙ্গে মিলেও চুরি-ডাকাতি করত। ১৭৯৫ এর অগাস্টে চৈতন শীল নামে চিনে বাজারের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে যে ডাকাতি হয়, সেই ডাকাতদলের এই রকম নানাজাতির লোকের সংমিশ্রণ ছিল। সুপ্রিম কোর্টে এদের বিচার হয়েছিল এবং ছয়জনকে চৈতন শীলের বাড়ির সামনে বাজারস্থলে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যে ফাঁসির উদ্দেশ্যে ছিল ওই প্রবণতাকে দূরীভূত করা। উল্লেখযোগ্য যে, ডাকাতরা স্বীকার করেছিল তারা বখরা পেয়েছিল ২৬ টাকা করে। এই দলে প্রায় ২০০ জন সদস্য ছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ইংরেজ সৈনিকরাও চুরি-রাহাজানিতে যুক্ত থাকত কোনও কোনও ক্ষেত্রে। ১৭৯৫-এরই এপ্রিলের একটা নোটিসে জানানো হয়েছিল গত দুই মাসে এসপ্লানেড ও কেল্লায় যাওয়া আসার পথে অনেকগুলি রাহাজানি হয়েছে, যাতে নীচ স্বভাব ইংরেজদের সঙ্গে কেল্লার সৈনিকরাও যুক্ত ছিল। নোটিসে ওই সময়ে ওই স্থানে যাদের রাহাজানি হয়েছে তাদের কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করতে বলা হয়েছে।

সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানি প্রশাসনের আন্তরিকতাই এখানে লক্ষ্য করার। উনিশ শতকের বাঙালি সুধী-সামাজিকরা যে ইংরেজের গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিল তার পিছনে কেবল মুসলমান শাসন বিরোধী মনোভাব আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভ কাজ করেনি। সুশাসনে ইংরেজের আন্তরিকতা, নিরপেক্ষতা সমীচীনতাও সেই আনুগত্যের একটা বড় কারণ। ইতিহাসে এ কারণ গুরুত্ব পায়নি পাওয়া উচিত। এসময়ের চোরডাকাতরাও সঙ্গে ভয়ংকর অস্ত্র রাখত এবং প্রয়োজনবোধে তা প্রয়োগ করতে দ্বিধা করত না। ১৭৮৯-এর এপ্রিলে বরানগরের দত্তরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সর্বস্ব ডাকাতি করে চলে যাওয়ার পর সময় যখন বোঝে দত্তরাম তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, তখন তারা ফিরে এসে রাম দা কুপিয়ে তাকে মেরে ফেলে। ওই বছরই অক্টোবর মাসে কলুটোলায় চেতন দত্তের বাড়িতে বাঙালি ও পর্তুগিজদের মিলিত ডাকাতের দল ডাকাতি করে। বাধা দিতে গেলে চেতন দত্তকে তারা আঘাত করে, আঘাতে চেতন দত্তের মৃত্যু হয়। ১৭৯০ সালের জুলাই মাসে আলিপুরের টার্নার সাহেবের বাংলোর বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করে।

পুলিশ প্রহরী প্রায়শ অঙ্গাঙ্গী, কিন্তু সেকালের পুলিশ চোর-ডাকাতের কাছে ঘুষ নিয়ে সরকারকে ভুয়ো রিপোর্ট দিয়েছে এমন তথ্য দুর্লভ। বস্তুত সেই জন্যই কলকাতার পুলিশ কর্মদক্ষতায় জগৎজোড়া সুনাম অর্জন করেছিল। উনিশ শতকে ডাকাতির সংখ্যা নগণ্য হয়ে গিয়েছিল তাদের কর্মদক্ষতায়। ক্রমানুপাতে কমেছিল বড় চুরির ঘটনাও। তবে শহর কলকাতায় লোকবৃদ্ধি ও ব্যস্ততাবৃদ্ধি চোরেদের রূপান্তর ঘটিয়েছে। জন্ম নিয়েছে পকেটমার। এরা বাড়িতে যায় না চুরি করতে, ট্রেন, বাস, ট্রাম, ব্যস্ত বাজার এগুলোই হচ্ছে পকেটমারদের কর্মক্ষেত্র। জালালউদ্দিন আজাদ নামে একজন পকেটমার জানিয়েছে, পকেটমারিটাই আগ্রহের বিষয়। ছেলেবেলায় স্কুলে চোর-পুলিশ খেলা বিষয় প্রবন্ধ লিখতে বসে পকেটমার বলেই কল্পনা করত। পরে গুরুর সে শিক্ষা নিয়েছিল সে ব্লেড চালানোর। তবে ধরা পড়ে জেলও খাটতে হয়েছিল তাকে।

গৃহস্থের এখন সতর্ক, তারা টাকা বা অলঙ্কার রাখে ব্যাংকের লকারে। তবে অনেক সময় কাজের মেয়েদের কেউ কেউ মনিব বাড়ির ধনরত্ন চুরি করা বা চুরি করানোয় যুক্ত থেকেছে। পুলিশের মতে, কলকাতায় বাড়িতে চুরির সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়ির কাজের মেয়েরা যুক্ত। রাস্তাঘাটে পকেটমারি বা চুরি-ছিনতাইতে মেয়েরাও সরাসরি যুক্ত এখন। ডাকাতি এখন আর বাড়িতে হয় না, বেশিরভাগ ডাকাতি হচ্ছে ব্যাংকে। সোনা বা মণিমুক্তোর দোকানেও ডাকাতি হয় প্রচুর। চুরি- ডাকাতিতে মেয়েরাও সক্রিয় এখন।

আজকের চুরি-ডাকাতি ধনলোভ আছে, জিঘাংসা নেই, সেকালের ডাকাতিতে ধনলোভের সঙ্গে ছিল জিঘাংসা। শিক্ষা ও সাধারণ অর্থব্যবস্থার যেটুকু উন্নতি হয়েছে, তাতেই পাল্টেছে। চুরি-ডাকাতির প্রক্রিয়া ও প্রকৃতি। গোপন ক্যামেরার ত্রাসন ও শাসন এক্ষেত্রে কাজে লেগেছে অনেকখানি।

মগ ও পর্তুগিজরা এ-সময়ের কুখ্যাত ডাকাত। চট্টগ্রাম ও বার্মা সীমান্ত থেকে এসে বাংলার নানা স্থানে দল বেঁধে ডাকাতি করত মগেরা। তবে তারা ডাকাতি করত প্রধানত জলপথে। এদের এই লুঠপাট ডাকাতি থেকেই মগের মুলুক প্রবাদ তৈরি হয়েছে বাংলায়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ২০ মার্চ ২০১৭



# ত্রিধারায় কদমতলা, বাবু, চাঁদপাল

**নীহারিকা**

প্রবাদ আছে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির ভয়ে বাঘে-গরুতে নাকি এক ঘাটের জল খায়। তেমন দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আজও হয়নি। আর সত্যি করে খায় কিনা তাও জানা নেই। তবে যে মৃন্ময়ী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তি ভরে পুজো করা হয়, সেই প্রতিমার কাঠামোর গায়েই ভিজে কাপড় শুকোনো আর তার ওপর নিত্যদিনের আবর্জনা ফেলার ছবি চোখে পড়ল বাঁজা কদমতলা ঘাটে গিয়ে। এই সবই ঘটে প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে।

জাজেস ঘাট থেকে আরও একটু এগোলেই এই ঘাট। পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিহার এবং ওড়িশার নানা প্রান্তে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন শ্রেণির বাস। এখান থেকেই টিকিট মিলবে এসব বাসের। এই ঘাটের কোনও সিঁড়ি নেই। চওড়া ঢালু পথ নেমে গেছে গঙ্গার দিকে। ফি-বছর দুর্গাপুজোর শেষে বিজয়াদশমীর দিন এখানে তিলধারণের জায়গা থাকে না। বিসর্জন দিতে আসা বিভিন্ন পুজোকমিটির সদস্য, মিডিয়ার সাংবাদিক, কুলির দল, রিভার ট্রাফিক পুলিশ, লালবাজারের বড়কর্তা, উৎসাহী জনসাধারণ প্রভৃতির ভিড়ে ঘাটটি হয়ে থাকে সরগরম। সঙ্গে ঢাকের বোল তো থাকেই। 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে বিসর্জন', এখন ফাল্গুনের সূর্যের তেজ বেশ কড়া। মাঝে মধ্যে গঙ্গার হাওয়া এসে শরীর ঠান্ডা করে দিচ্ছে। ঘাটে ভিড় নেই। শুধু কিছু মানুষ স্নান সেরে নিচ্ছেন।

পরিবেশবিদদের রক্তচক্ষু, পুরসভার বিধি-নিষেধ ও সাধু উদ্যোগ সত্ত্বেও জলে ভাসছে কিছুদিন আগে শেষ হয়ে যাওয়া সরস্বতীর পুজোর প্রতিমা আর অনেক পরিমাণে বিকৃত হয়ে যাওয়া বিসর্জিত ফুল। ঘাটের কিছুটা দূরে, প্রায় মাঝ গঙ্গার কাছে বয়ায় নোঙর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝারি আকৃতির কয়েকটি স্টিমার। কলকাতা ঘুরতে আসা অল্প সংখ্যক বিদেশির দল ক্যামেরার লেন্সে চোখ লাগিয়ে হাওড়া ব্রিজের ছবি তুলছেন। অপরিচ্ছন্ন রাস্তা, কাটা ফল, বাসের খালাসিদের হাঁক-ডাকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাই বাবুঘাটের উদ্দেশে।

ঘাটের এমন অদ্ভুত নামের পিছনে কারণ জানার জন্য আবার ইতিহাসের পাতা ওল্টাই। ঔপনিবেশিক স্থাপত্য রীতি অনুসারে নির্মিত ঘাটটির সম্পূর্ণ নাম হল 'বাবু রাজেন্দ্র দাস ঘাট।' কলকাতার জানবাজার এলাকার জমিদার রাজচন্দ্র দাসের নামে নামাঙ্কিত। তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রানি রাসমণির স্বামী। ১৮৩০ সালে তাঁর স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে এই ঘাট নির্মিত হয়। এটি কলকাতার দ্বিতীয় প্রাচীনতম ঘাট। বর্তমানে প্যাভেলিয়নটি হিন্দু পুরোহিত ও হকারদের বসার জায়গা। ঘাটের পুরনো ঔপনিবেশিক কাঠামোটি এখন ভগ্নপ্রায়। মহিলাদের স্নানের জন্য ঘাটের যে অংশটি নির্ধারিত হয়েছিল সেটা এখন আস্তাকুড়ে পরিণত হয়েছে। সারাদিন ধরেই এই ঘাটে বহু মানুষ স্নান করেন। এই স্থানে পুজো-পার্বণও হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ঘাটটি ব্যবহৃত হয়। হাওড়া রেলস্টেশন ও হাওড়া শহরে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য বাবুঘাটের লঞ্চ ঘাটটিতে প্রতিদিন ভিড় হয়।

এখান থেকে নিয়মিত ফেরি পরিষেবা দেওয়া হয়। পরিষেবার দায়িত্বে আছে আন্তর্দেশীয় জলপথ কর্পোরেশন। বাবুঘাট থেকে হাওড়ার তেলকল ঘাট, বালি, রামকৃষ্ণপুর ইত্যাদি ঘাটে যাওয়া যায়। চক্ররেলের ইডেন গার্ডেন্স রেলস্টেশনটি বাবুঘাট সংলগ্ন। এই ঘাটের খুব কাছেই অবস্থিত নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা, ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাব, আকাশবাণী, কলকাতা হাইকোর্ট, টাউন হল ইত্যাদি। এর অদূরেই কলকাতার ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদপালঘাট। এটিকেও শহরের আরও একটি ব্যস্ততম ফেরিঘাট বলা যায়।

১৭৭৪ সালে এই ঘাটে এসে নেমেছিলেন প্রিন্স ফ্রান্সিস এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্তর্গত সুপ্রিম কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা। এই বিশেষ ঘটনাটি সেই যুগে চাঁদপালঘাটকে অন্যান্য ঘাটের থেকে স্বতন্ত্র করে। কোনও বনেদি পরিবারের সদস্য বা জমিদারের নামে এই ঘাটটির নামকরণ হয়নি। স্থানীয় মুদিখানার মালিক চন্দ্রনাথ পালের নামে চাঁদপালঘাটের নামকরণ করা হয়েছিল।

ঘাটের নীচের জলরাশি নিরন্তর বয়ে চলেছে। স্রোতে শুধুই যাওয়া-আসা। সে এক জায়গায় কখনই স্থিত নয়। কিন্তু প্রাচীন এই শহরের ঘাটগুলো এখনও বর্তমান। তারাই পথিকদের জানাচ্ছে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের কথা।

বাঁজা কদমতলা ঘাট

বাবুঘাট

চাঁদপাল ঘাট



# রম্যজাদুকর রাজশেখর

**নীলাঞ্জন**

১৯৩৪ সালের ১৭ এপ্রিল মঙ্গলবার কলকাতা শহর থেকে প্রকাশিত সমস্ত ইংরেজি এবং বাংলা সংবাদপত্রের শিরোনামে দেখা গেল একটি মর্মস্পর্শী খবর। 'স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় সাধ্বীর প্রাণ বিয়োগ, অনতিকালপরেই স্বামীর মৃত্যু'। এমন একটি দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর নাম। কারণ ১৯৩৪ সালের ১৫ এপ্রিল রবিবার মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সে প্রৌঢ় রাজশেখর বসুর জীবনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো নেমে এসেছিল এই চরম আঘাত। একই দিনে মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে তাঁর একমাত্র সন্তান প্রতিমা ও জামাতা অমরনাথ পালিতের মৃত্যু হয়। অনেকদিন ধরেই জামাতা অমরনাথ ভুগছিলেন দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে। সেই যুগে এই রোগের কোনও চিকিৎসা ছিল না। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পরিবারের সদস্যরা মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন এই অকালমৃত্যুর জন্য। তবুও স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তীব্র মনোকষ্টে মূর্ছা যান স্ত্রী প্রতিমা। জ্ঞান আর ফিরল না। এরই কয়েক ঘণ্টা পরে চলে গেলেন অমরনাথ। দু'জনের নিথর দেহ দাহ করা হল একই চিতায়। কন্যা এবং জামাতার আকস্মিক প্রয়াণ এক অদ্ভুত রূপে ধরা পড়ল দার্শনিক রাজশেখর বসুর চোখে। স্বকীয় সাহিত্য প্রতিভা তাঁকে থেমে থাকতে দিল না। তাঁর লেখনী থেকে সৃষ্ট হল কবিতা 'সতী'। কিন্তু পাঠকেরা কবিতাটির কথা জানতে পারলেন আরও পরে। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে রাজশেখরের মৃত্যুর মাস দুয়েক পরে এই কবিতাটি জনসমক্ষে আসে।

বাংলা সাহিত্যের এক বিরল প্রতিভার নাম রাজশেখর বসু। পরশুরাম ছদ্মনামেও তিনি সমান সক্রিয়। পারিবারিক স্বর্ণব্যবসায়ী তারাচাঁদ পরশুরামের পদবি ধার করে রাজশেখর হলেন পরশুরাম। বর্ধমান জেলায় তাঁর জন্ম হলেও ছোটবেলার বেশিরভাগটাই কাটে বিহারে। প্রথমে দ্বারভাঙ্গা এবং পরে পাটনা। পাটনা শহরই রাজশেখরকে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করায়। স্কুলের গণ্ডি পার করে চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকেই বিএ এবং এমএ পাশ করেন। একই সঙ্গে ওকালতিও পাস করেন। পরিচয় হয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। তাঁরই অনুপ্রেরণায় ১৯০৩ সালে যোগ দেন আচার্য প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস' নামক কোম্পানিতে। ১৯৩২ সালে সংস্থা থেকে অবসরের পরেও বেঙ্গল কেমিক্যালসের সঙ্গে তাঁর সংযোগ রয়ে গিয়েছিল। ১৯২৪-এ প্রকাশিত হল রাজশেখরের প্রথম গল্পের বই 'গড্ডালিকা', যা পড়ে মুগ্ধ হলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রাজশেখরের দাক্ষিণ্যেই ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হল প্রথম বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা'।

চলন্তিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ছিল, 'অবশেষে বাংলা ভাষায় আমরা অভিধান পেলাম।' রাজশেখরকে কবি লিখলেন, 'ব্যাকরণের যে নতুন ধারা তুমি এই অভিধানে সংযোজন করেছ, তা এক কথায় অনবদ্য।' রবীন্দ্রছাত্র প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, লেখক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, 'সুখের বিষয় বাংলা ভাষায় অতিকায় অভিধানের অভাব নেই, তৎসত্ত্বেও চলন্তিকা অপরিহার্য। প্রথম কারণ, এর আয়তন বিভীষিকা ব্যঞ্জক নহে, যে সব শব্দ, সাহিত্য ও সংলাপে নিত্য চলে, চলন্তিকা তাঁরই সংযোগ। এর আগে বাংলা বানানবিধি সংক্রান্ত যে কমিটি গঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাংলার এই প্রথিতযশা সাহিত্যিক। বানান তত্ত্ব নিয়ে রাজশেখর বসুর অবদান অনস্বীকার্য। জীবনযুদ্ধে যতই ঝড় আসুক না কেন, তাঁর মন্ত্র ছিল 'হয়েও নাকো কুণ্ঠিত, তালে তাল দিয়ো তাল, জয় জয় জয় গান গাইও।'

স্ত্রী, মেয়ে, জামাই ও নাতনি সহ রাজশেখর বসু

সন্তান বিয়োগে ব্যথিত চিত্ত, তবুও কলম দিয়ে বেরোল 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'গল্পকল্প', 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'কচি সংসদ', 'জাবালি', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'ভুশণ্ডীর মাঠ' ইত্যাদি। অনুবাদ করলেন কালীদাসের 'মেঘদূত', 'বাল্মীকি রামায়ণ', 'হিতোপদেশের গল্প'। তাঁর প্রবন্ধাবলিও উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আছে 'লঘুগুরু', 'ভারতের খনিজ', 'কুটির শিল্প' প্রভৃতি। তবে রাজশেখরের কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয় লেখকের মৃত্যুর পরে। তাঁর লেখা 'পরশপাথর', ও 'বিরিঞ্চিবাবা' অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের 'মহাপুরুষ' ছবি দু'টির কথা কে না জানেন। কন্যা ও স্ত্রীর প্রস্থানের পরেও এই পৃথিবীতে আঠারো বছর ছিলেন রাজশেখর। পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক, সরোজিনী পদক, ডিলিট উপাধি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে ডিলিট দিয়ে সম্মানিত করে। 'কৃষ্ণকলি' ও অন্যান্য গল্পের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন ১৯৫৫ সালে। এর পরের বছর পেয়েছিলেন পদ্মভূষণ। পেয়েছিলেন আকাদেমি পুরস্কারও। অবশেষে ঘুমের ঘোর এল ১৯৬০ সালের ২৭ এপ্রিল। সেই ঘুম আর ভাঙল না। বাংলা সাহিত্যকে চিরতরে জাগিয়ে রেখে গেলেন তাঁর সরস রম্যরচনার মাধ্যমে।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২০ মার্চ ২০১৭

স্টুডিও @ কলকাতা

# উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

**শৈবাল পত্রনবীশ**

**পর্ব: পাঁচ**

নিউ থিয়েটার্স মানেই ইতিহাস, আর সেই ইতিহাসের সঙ্গে কত মানুষের নাম যে জড়িয়ে রয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। ভারতবিখ্যাত এই স্টুডিও এবং প্রযোজক সংস্থায় পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, দেবকীকুমার বসু, নীতিন বসু, হেমচন্দ্র চন্দ্র, সতু সেন, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌমেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। হ্যাঁ, তিনের দশকের শুরুর দিকে কবি এসেছিলেন টালিগঞ্জের স্টুডিওতে, ছবি পরিচালনা করতে। তাঁর বয়স তখন ৭০। তাঁর ৭০তম জন্মবর্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল, সাহেবরাও পিছিয়ে ছিলেন না। চলচ্চিত্র জগতে সরকার সাহেবকে সবাই 'সাহেব' বলেই ডাকতেন। সাহেব ঠিক করলেন রবীন্দ্রনাথের ৭০ জন্মবর্ষ একটু অন্যরকম ভাবে পালন করবেন। সব কিছুতেই ওঁর আইডিয়াটা ছিল অন্যধরনের। সেই ভাবনা থেকে কবির 'নটীর পূজা' চলচ্চিত্রায়িত করার কথা ভাবলেন।

খবর গেল শান্তিনিকেতনে। গুরুদেব অত্যন্ত উৎফুল্ল। বোলপুর থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন নিউ থিয়েটার্সে। স্টুডিও চত্বরে ঢুকে তিনি রীতিমতো অবাক হলেন। স্বতঃফূর্ত ভাবে বললেন, 'এ যেন আমার দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন।' স্টুডিওতে কবির আগমন উপলক্ষে বিখ্যাত গোলঘরটিকে আলপনা ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। যে-চেয়ারটিতে রবীন্দ্রনাথ বসেছিলেন, আমৃত্যু সরকারসাহেব কোনওদিনও সেই বিশেষ চেয়ারটি ব্যবহার করেননি এবং অন্য কাউকে সেটি ব্যবহার করতেও দেননি। সরকারসাহেব কবির অনুভূতি উপলব্ধি করে বললেন, 'গুরুদেব, আমাদের ইচ্ছা আপনি নিজে 'নটীর পূজা'র চিত্রপরিচালনা করুন।' কবি অনভিজ্ঞ হওয়ায় একটু দ্বিমত করেছিলেন, বি এন সরকার বলেছিলেন, 'আপনার চিন্তার কিছু নেই। আপনি আপনার মতো সাজিয়ে নিন আর সহযোগিতা করার জন্য আমাদের এখানে খুব ভালো টেকনিশিয়ানরা রয়েছেন।'

শুরু হল 'নটীর পূজা'-র চলচ্চিত্রায়ন। সেদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, নীতিন বসু, রমেন্দ্রনাথ সরকার, সহধর্মিনী হেমন্তবালা দেবী সহ বি এন সরকার নিজে। ক্যামেরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নীতিন বসুকে। শব্দযন্ত্রী হিসাবে ছিলেন তাঁরই ভাই মুকুল বসু। ছবিতে অভিনয় করলেন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের কিছু নির্বাচিত ছাত্রছাত্রী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী মায়া সেন। শুটিং চলাকালীন ফ্লোরের একপাশে কোচে কবি বসেছিলেন। তাঁর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জেনে নিচ্ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তারপর সেইমতো তিনিও সংগঠিত করছিলেন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। চলচ্চিত্রের ভাষায় তাঁকে 'নটীর পূজা'-র সহকারী চিত্রনির্মাতা বলা যায় অনায়াসেই। 'নটীর পূজা' ছবিতে কবি স্বয়ং অভিনয় করেন উপালির ভূমিকায়। শেষ পর্যন্ত তৈরি হল, বিশ্বকবি পরিচালিত প্রথম এবং একমাত্র ছবি।

দুঃখের বিষয় নিউ থিয়েটার্স ল্যাবরেটারিতে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেই সৃষ্টি পুরে ছাই হয়ে যায়। এমনকী পুনার ন্যাশানাল ফিল্ম আর্কাইভেও এর কোনও কপি নেই। অবশ্য কিছুটা অংশ সযত্নে রক্ষিত রয়েছে টালিগঞ্জের রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে ১৬ মিলিমিটার ফিল্মক্যানে। তারই একটি কপি মিনি ডিভিক্যামের আকারে রেখে দেওয়া হয়েছে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায়। আংশিক এই ছবিটি একাধিক জায়গায় প্রদর্শিত হয়েছিল ২০১১ সালে কবির জন্ম সার্ধশতবর্ষে।

'নটীর পূজা' সম্পর্কে রবীন্দ্রানুরাগী চিত্রনির্মাতা তপন সিংহের সুযোগ হয়েছিল আরেক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি টি এস এলিয়টের সঙ্গে কথা বলার। ১৯৫০ সালে তপনবাবু লন্ডনে গিয়েছিলেন পাইনউড স্টুডিওতে কাজ করতে। সেখানে থাকাকালীন একদিন লন্ডন ইউনিভার্সিটির খুব কাছের এক রাস্তায় দেখলেন একটা ঝরঝরে গাড়ি পার্ক করে হেঁটে যাচ্ছেন এলিয়ট সাহেব। ঠিক করলেন একদিন এলিয়টের অফিসে হানা দেবেন। গেলেন, দেখাও হল। অত বড় কবির সময় নষ্ট করতে চাননি তপন সিংহ। আলোচনা চলাকালীন 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল'-এর কথা উঠতে এলিয়ট বলেছিলেন, 'লন্ডনে মঞ্চস্থ হয়েছিল, কিন্তু একেবারে ফ্লপ, চলেইনি' বলে হাসতে লাগলেন। তপনবাবু উত্তরে বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে 'নটীর পূজা' ছবি পরিচালনা করেছিলেন, কিন্তু সাতদিনও চলেনি।' সেই কথা শুনে কবি এলিয়ট হা হা করে হেসে ওঠেন।

ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩২ সালের ২২ মার্চ, চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে। বলা বাহুল্য ছবিটি একেবারেই বাণিজ্যিক ভাবে সফল হয়নি। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ সরকারের বিচক্ষণতায় স্থায়ী ভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম সংযোজিত হল ভারতীয় চলচ্চিত্রের চিত্রনির্মাতাদের তালিকায়।

*(চলবে)*

বেতার @ কলকাতা

# শুভেচ্ছায় বীণাপাণি

**মনীষা ভট্টাচার্য**

**পর্ব: দুই**

অবশেষে ঠাকুমার ইথার তরঙ্গ থুড়ি ঠাকুমার কাঠের বাক্সর ইথার তরঙ্গ ধরা গেছে। 'ঠাকুমা-মা-মা-মা, তোমার রেডিও এখন কথা বলছে ঠিক ঠাক। নাও, শোনো। শুরু হবে তোমার অনুরোধের আসর। 'আজ আকাশের মনের কথা, ঝরো ঝরো বাজে, সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।' এই গান কানে ভেসে আসতে মনে হল, সত্যিই তো আকাশের কথাই তো সারাদিন ধরে সবার ঘরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশবাণীতে আকাশের কথা! শুরুর কথা তো গত সংখ্যায় বলেছি। আজ তার পরের ইতিহাস।

১৯২৭ সালের ২৬ অগাস্ট কলকাতার এক নম্বর গার্স্টিন প্লেসের বাড়িতে উদ্বোধন হয় ভারতের দ্বিতীয় বেতারকেন্দ্রটির। উদ্বোধক ছিলেন তদানীন্তন গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন। স্টেশন ডিরেক্টর হন মি. সি সি ওয়ালিক। ভারতীয় অনুষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ক্ল্যারিওনেটবাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। ঘোষণা ও সংবাদপাঠে নিযুক্ত হন ১৯১১ সালের আইএফএ শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কর্মসূত্রে যোগ দেন রাইচাঁদ বড়াল, হীরেন বসু, নলিনীকান্ত সরকার, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য অর্থাৎ বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিজন বসু প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য, ১৯২৮ সালের এপ্রিলে কলকাতা বেতারে প্রথম গান গাইলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সব থেকে বড় কথা বেতারের শুরু থেকেই ছিল নানা বৈচিত্রময় অনুষ্ঠান। স্কুল, কলেজ, ফুটবল, ক্রিকেট, জলসা সব ধরনের অনুষ্ঠানই স্থান পেয়েছে এখানে। ১৯২৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে বেতারের অনুষ্ঠানসূচিজ্ঞাপক পাক্ষিক পত্রিকা 'বেতার জগৎ'। নামকরণ করেন বীরেন রায়, সম্পাদক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

এখন প্রশ্ন হল, এমন এক কালজয়ী সৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত হয়েছে কবে থেকে? সালতামামি বলছে ১৯২৭ সালে মিডিয়াম ওয়েভ দিয়ে যাত্রা শুরু, পরে ১৯৩৩ সালে যুক্ত হয় শর্টওয়েভ, এর ঠিক পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের অগাস্টে বসানো হয় ১০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার। এই ট্রান্সমিটার উদ্বোধন উপলক্ষে 'বেতার জগৎ' পত্রিকার ১৬ অগাস্ট সংখ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা প্রকাশের জন্য উদ্যোগী হন দাদাঠাকুরের সাকরেদ নলিনীকান্ত সরকার। সংগীতবিভাগের সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতন যান এবং কবির একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে তাঁর মনের কথা খুলে বলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অসুস্থ। কবির সঙ্গে দেখা করেও কোনও লাভ হল না, চিকিৎসকের নিষেধ থাকায় কবি কিছুই লিখে দিতে পারলেন না। ব্যর্থ মনে ফিরলেও চারদিনের মাথায় নলিলীকান্তের কাছে কবির নিজের হাতে লেখা একটি কবিতা সহ সুধাকান্তবাবুর চিঠি এসে পৌঁছয়। অভিভূত নলিনীকান্ত। ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয়পক্ষের বেতার জগতে কবিতাটি মুদ্রিত হয়। কোনও শিরোনাম ছিল না। তবে কবিতাটিতে ব্যবহৃত 'আকাশবাণী' শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে ৫ অগাস্ট ১৯৩৮ সালে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, 'ধরার আঙিনা হ'তে ঐ শোনো, উঠিল আকাশবাণী, অমরলোকের মহিমা দিল যে মর্ত্যলোকেরে আনি। সরস্বতীর আসন পাতিল, নীল গগনের মাঝে, আলোক-বীণার সভামণ্ডলে, মানুষের বীণা বাজে। সুরের প্রবাহ ধায় সুরলোকে, দূরকে সে নেয় জিনি, কবি-কল্পনা বহিয়া চলিল, অলখ সৌদামিনী। ভাষা-রথ ধায় পূবে-পশ্চিমে, সূর্যরথের সাথে, উধাও হইল মানবচিত্ত, স্বর্গের সীমানাতে।' গুরুদেবের এই শুভেচ্ছাবাণীতে সবাই খুব খুশি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে বেতারের সঙ্গে কবির অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে যা পরবর্তী পর্বে বলা যাবে।

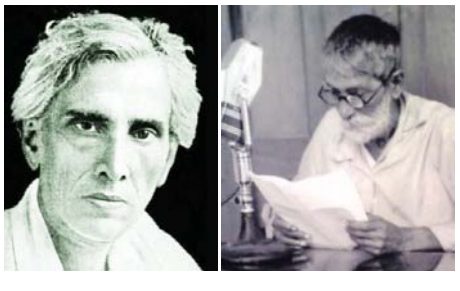



শুধু কি রবীন্দ্রনাথ, শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে লেখা শরৎবাবুর শুভেচ্ছাপত্রে ছিল, 'বেতার প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে সুখে-দুঃখে ভয়ে-ভাবনায় পাঁচ বৎসর অতিক্রম করিল। 'বেতার জগৎ' ইহারই মুখপত্র। ...বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদীজলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে। আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদীতটে আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি। তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বেতারের বাঁশির সুর যেন মায়াজাল রচনা করে। দু-একজন করিয়া প্রতিবেশি জুটিতে থাকে। ...আমার পল্লীবাসরের সাথী এই বেতার বস্তুটির আন্তরিক কল্যাণ কামনা না করিয়াই পারি না।' অন্যদিকে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর শুভেচ্ছায় লিখলেন, 'বাঙ্গালি জাতি যে বেতারকে বরণ ক'রে নিয়েছে-এটা খুব আনন্দের কথা। বেতার বৈজ্ঞানিক জগতের নবতম সৃষ্টি। ...আমাদের বাঙ্গলা দেশের বেতারও কেবলমাত্র গানবাজনা, আমোদপ্রমোদ পরিবেশন করে ক্ষান্ত হয়নি, নরনারীর শিক্ষার প্রসারের জন্যও বেতারের পরিচালক মহাশয়েরা যথেষ্ট যত্নবান। বেতারের বয়স আমাদের দেশে পাঁচ বৎসরের পূর্ণতা লাভ করেছে। ...বাঙ্গালা দেশের বেতার প্রতিষ্ঠান দীর্ঘায়ু লাভ করে দেশের ও দশের সেবায় নিযুক্ত থাকুক।'

প্রবাদপ্রতিম এই সব মানুষের শুভেচ্ছায় ও আশীর্বাদে সেদিনের কলকাতা বেতার আজও পথ চলছে। কলকাতা 'ক', কলকাতা 'খ', বিবিধভারতী, যুববাণী, এফএম গোল্ড, এফএম রেইনবো, আকাশবাণী মৈত্রী– বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় আজ সে বিস্তৃত। একটি ছোট্ট তথ্য জানিয়ে আজকের পর্ব শেষ করব। ১৯৬২ সালের ২ জুলাই পার্বত্য শহর কার্শিয়াং-এ আকাশবাণীর একটি বেতারকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী গোপাল রেড্ডি। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিককে নিমন্ত্রণ জানান বেতার মন্ত্রীর অনুরোধে দিল্লি বেতারের কর্তৃপক্ষ। এই আমন্ত্রণ পেয়ে শিল্পী জানান বেতার কর্তৃপক্ষ যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকাশবাণীর উদ্দেশে লেখা অনবদ্য বাংলা কবিতায় বিশ্বভারতীয় সৌজন্যে সুরসংযোজন করে গাইবার অনুমতি দেন তবেই তিনি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন। গোপাল রেড্ডি নিজের প্রচেষ্টায় সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং পঙ্কজবাবু কবির সেই বাংলা কবিতায় আশা-ভৈরোঁতে সুর দিয়ে গানটি উদ্বোধনী সংগীতরূপে পরিবেশন করেছিলেন।

পঙ্কজবাবুর আরও একটি ইচ্ছে ছিল, তাঁর সুর দেওয়া কবির এই রচনা আকাশবাণীর সিগনেচার সং হিসাবে প্রচারিত হোক। তাঁর এই বাসনা পূর্ণ না হলেও, গোপাল রেড্ডির সচেষ্টায় তিনি এই গান শিখিয়েছিলেন বেতারের সংগীত-শিক্ষার আসরে। কবিগুরুর সঙ্গে বেতারের যে এক অম্ল-মধুর সম্পর্ক ছিল, তাই নিয়েই সাজাব পরবর্তী পর্ব।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২০ মার্চ ২০১৭



# সেই ক'দিনের রেশ আজও তাজা হয়ে আছে

**মেহেদি হাসান** (লেখক)

'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে' না, গানের ওপারে নয়। সীমানার ওপারে। মাঝখানে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণের ইতিহাস নিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে কাঁটা তার। যার ওপারে ভারতবর্ষ। এপারে বাংলাদেশ। অবিভক্ত বঙ্গভূমির মাটি হয়েছে ভাগ। তৈরি হয়েছে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র। আলাদা সেই রাষ্ট্রের সংবিধান। তবু গর্ভজাত ভাইয়ের মতো দু'দেশের শিরায় বইছে একই ভাষা, একই সংস্কৃতির রক্ত। যে রক্তের কোনও দেশ নেই। রাষ্ট্র নেই। শুধু আছে হৃদয়ের এক অমোঘ টান। আর তার টানেই তো অনিরুদ্ধ বোসের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ভারত তথা কলকাতায় আসা।

প্রায় বছর দুয়েক আগে অনিরুদ্ধ বোসের সাথে আমার পরিচয় হয় একুশে বইমেলায়। তারপর ফোন, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ পেরিয়ে একেবারে কলকাতায় অনিরুদ্ধ বোসের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। হ্যাঁ, কলকাতা। না তোমার শহর, না আমার শহর, কয়েক দিনের জন্য কলকাতা হয়ে উঠল আমাদের শহর। কলকাতার রাস্তাগুলো হয়ে উঠল আমাদের রাস্তা। ঢাকা থেকে মৈত্রী এক্সপ্রেসে উঠে চিৎপুর স্টেশনে এসে নামলাম। স্টেশন থেকে বেরতেই দেখলাম একটা পলাশ গাছের নীচে, হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরে অনিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই ও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানাল। কবিবন্ধু অনিরুদ্ধ বোসের ডাকে প্রথমবার কলকাতা আসা আমার। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'মাঙ্গলিক'-এর অনুষ্ঠানে।

যাই হোক তারপর অনিরুদ্ধর গাড়িতে এসে উঠলাম। গাড়ি ছুটে চলল চিৎপুর থেকে অনিরুদ্ধর ফ্ল্যাট গল্ফগ্রিনের উদ্দেশে। আমি জানালার পাশে বসে মোহিত হয়ে উপভোগ করছিলাম, গল্পে পড়া নগর কলকাতাকে। গাড়ি একে একে পেরিয়ে যাচ্ছে একটা একটা করে ব্যস্ততম রাস্তার মোড় আর অনিরুদ্ধ বলে যাচ্ছে প্রত্যেকটি জায়গার কত পুরনো ইতিহাসের কথা। শেষমেশ সাউথ সিটি মল পেরিয়ে পৌঁছলাম বন্ধুর বাড়ি। ওর ফ্ল্যাটে ওরা তিনটি মানুষ থাকে। ওর সাথে পত্নী জয়া আর ছেলে সৌম্য। যাই হোক পৌঁছলাম। যেদিন পৌঁছলাম, মনে আছে তার পরদিনই ছিল পত্রিকার অনুষ্ঠান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানটি শেষ হল। অনিরুদ্ধর সাথে আগেও কথা হয়েছে পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানের পরপরই ঢাকা ফিরব। তা আর হল না, অনিরুদ্ধ চারদিন অফিস ছুটি নিল। প্রথমদিন আমরা বেরোলাম– দেখলাম সায়েন্সসিটি, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। সে এক অদ্ভুত আনন্দের প্রাক্কাল। এর পর রাতে ফিরে অনিরুদ্ধ ঠিক করল আগামিকাল শান্তিনিকেতন যাওয়া হবে ওর গ্রামের বাড়িতে, আর আমাকে যেতেই হবে। আমি তো মেঘ না চাইতে জল পেলাম। বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বাড়ছিল। প্রবল আনন্দের সে এক স্মরণীয় দিন আমার। শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরে বোলপুর নেমে দেখি, অনিরুদ্ধর ভাই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। সেই দিনটায় পৌঁছলাম ওদের গ্রামের বাড়ি– কত ভাগ্য নিয়ে জন্মালে এত ভালোবাসা পাওয়া যায় আমি জানি না।

তবে এখানে আসার পর আমি ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিলাম রবি ঠাকুরে। যেজন্য আমাদের এখানে আসা তার কারণ হল, এখানের শান্তিনিকেতনের সেই বিখ্যাত বসন্ত উৎসবে যোগ দিতে। হোলির দিন সকালে আমরা সবাই পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়লাম রঙের খেলায় মাতোয়ারা হতে। বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণ সেজে উঠেছে লালে-হলুদে-সবুজে। শাড়ি আর পাঞ্জাবির নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর সেই প্রথম সামনে রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতনকে দেখা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না– সে আনন্দ আর আবেগের কথা। গানে গানে প্রভাতফেরি দিয়ে শুরু করে মঞ্চে সংগীত, নৃত্য, নাটকের অনন্য পরিবেশনার পর মঞ্চ থেকে আবির উড়িয়ে সূচনা হল রঙের খেলার। এই দিনটি ছিল আমার কাছে জীবনের অন্যতম স্মরণীয় একটা দিন। তারপর রঙের খেলার পর সন্ধ্যায় শুরু হল মঞ্চে ফের একের পর এক মনোজ্ঞ উপস্থাপনা। তারপর দিন আমারও দেশে ফেরার তাড়া, অনিরুদ্ধরও অফিস। ট্রেনে কলকাতায় ফিরতে ফিরতে বারবার মনে হচ্ছে এ দেখা এক অমলিন অধ্যায় স্বয়ং কবিগুরুর নিজের হাতে বানানো এক মেদুর সংস্কৃতি। ছুঁয়ে যাচ্ছিল হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে।

আমাকে স্টেশনে ছাড়তে এলো অনিরুদ্ধ। মনটা বড় বিষণ্ণ। মাঝের ক'টা দিন আমার কাছে স্বপ্নের মতো কেটেছে। আমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি প্রিয় বন্ধুকে, প্রিয় কলকাতাকে। তারপর আর কলকাতা যাওয়া হয়নি নানা কারণে। তবে সেই ক'দিনের রেশ আজও তাজা হয়ে আছে। সময় সুযোগ পেলেই চলে যাব প্রিয় শহর কলকাতার কাছে।



# জীবনে পদ্ম পাতার জল

**রনজিৎ ভট্টাচার্য**

'যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে, অথচ যার মুখ আমি কোনওদিন দেখিনি, সেই নারীর মতো, ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে।' (নগ্ন নির্জন হাত) ফাল্গুন আকাশে ঠিক অন্ধকার নয়, অন্ধকারের মাঝে যে আলোর পথ রয়েছে, তারই কথা বলতে যেন এই ফাল্গুনেই, ওপার বাংলায় জন্ম হল তাঁর। তিনি মূলত কবি। তাঁর ভাষায়, 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।' তিনি লিখেছিলেন, 'আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল, এই জীবনের পদ্মপাতার জল, তবু এ জল কোথায় থেকে এক নিমেষে এসে কোথায় চলে যায়, বুঝেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে, রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।' (তোমাকে ভালোবেসে) এর পরে আশা করি আর কবির নাম বুঝতে অসুবিধে নেই জীবনানন্দ দাস।

কবি ওপার বাংলার বরিশালে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং ব্রজমোহন কলেজ থেকে আইএ পাসও করেন প্রথম বিভাগে। এরপর তিনি আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ইংরেজি অনার্স নিয়ে বিএ পড়ার সময় মনোমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় মুদ্রিত 'বর্ষ আবাহন' কবিতার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ। পড়াশোনা সমাপ্ত করে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখতে থাকেন এই সময়। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগন্থ 'ঝরাপালক'। ওই বছরই 'কল্লোল' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এর সমালোচনাও প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে বলি, 'ঝরাপালক' পড়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে চিঠি লিখেছিলেন, 'কল্যাণীয়েষু, তোমার কবিত্ব শক্তি আছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারি নে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদিকে পরিহসিত করে। বড়জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয়, বরঞ্চ উলটো।' তবে এই চিঠির সাল তামামিতে একটু সমস্যার জন্য বুঝতে অসুবিধে হয় রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি 'ঝরাপালক' পড়েই লিখেছিলেন কিনা, কারণ এই চিঠির শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২২, কিন্তু ঝরাপালক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে। এই বই প্রকাশের প্রায় ৮/৯ বছর পর প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'।

এটিও জীবনানন্দ পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। জীবনানন্দের চিঠিটি ছিল 'শ্রীচরণেষু, আপনি আধুনিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও মনীষী।...জার্মান সাহিত্যে গোথে, ইংরেজি সাহিত্যে শেক্সপিয়র, এর যে স্থান আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।...আমি একজন বাঙালি যুবক, মাঝে মাঝে কবিতা লিখি।...প্রায় নয় বছর আগে আমি আমার প্রথম কবিতার বই একখানা আপনাকে পাঠিয়েছিলুম। সেই বই পেয়ে আপনি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানা আমার মূল্যবান সম্পদের ভিতর একটি।...' জীবনানন্দের এই চিঠি থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখটি কোনও কারণে ভুল ছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়েও রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছিলেন। তবে সে চিঠি বড়ই ছোট। 'কল্যাণীয়েষু, তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।' বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি পড়েও রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন, 'তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। ...জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।' কবিতাটি ছিল 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যুর আগে'।

দুই কাব্যগ্রন্থের পর কবির জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত আরও তিনটি কাব্যগ্রন্থ হল 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) এবং শুরু থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে লেখা কবিতাগুলি থেকে কিছু কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' যা ১৯৪৭-১৯৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা বই বিবেচিত হয় ও ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়। মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'রূপসী বাংলা', 'বেলা অবেলা কালবেলা' ইত্যাদি। পাশাপাশি তাঁর লেখা কিছু প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং গল্পও প্রকাশিত হয়। তবে জীবিতাবস্থায় তাঁর তেমন সুখ্যাতি হয়নি। বহুবার চাকরি ছেড়েছেন, চাকরির খোঁজ করেছেন। ফিরে গেছেন জন্মস্থান, বরিশালে। কিন্তু স্থিতু হতে পারেননি কোথাও। ফিরে এসেছেন এই কলকাতাতেই। দিল্লিতে চাকরি পেয়েও কলকাতাকে ছেড়ে যেতে চাননি। মারাও গেছেন এই শহরের বুকেই। ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে, কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে।

জীবন থেকে রস কুড়িয়ে নিয়েছেন যতটুকু পেরেছেন, তবু তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন 'তবু কেন এমন একাকী? তবু আমি এমন একাকী।' এই একাকীত্ব থেকেই তাঁর সুচিন্তিত বিবৃতি,

'জানি-তবু জানি,
নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি,
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়-
আরও এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে,
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত- ক্লান্ত করে,
লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নেই,
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।'
(আট বছর আগের একদিন)

যুগশঙ্খ SUPPLI | পরিকল্পনা ও সম্পাদনা: বিপ্লব রায় | 'কলকাতা' ক্রোড়পত্রটি আপনাদের কেমন লাগছে jugasankha.suppli@gmail.com আইডি-তে মেল করে জানান।